সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা : একটি পর্যালোচনা

জেনিনা ইসলাম আবির

‘সতী’, ‘কাজের মেয়ে’, ‘এক টাকার বউ’, ‘চাঁদের মতো বউ’— মূলধারার এ ধরনের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের নামকরণ থেকেই জেন্ডার অসংবেদনশীলতার চিত্রটি একনজরে তুলে ধরা যায়। নামগুলো থেকেই অনুধাবন করা যায়, এগুলো নির্বাচন করা হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ হয় অনেক সংগ্রাম, সম্ভাবনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যতই দিন অতিবাহিত হয়েছে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে। মূলধারা, বিপরীত ধারা নানা ধরনের চলচ্চিত্র এসেছে সময়ের বিবর্তনে। কিন্তু চলচ্চিত্র সমাজেরই প্রতিফলক হিসেবে নারী-পুরুষের প্রথাগত সম্পর্কের বাইরে যেতে পারে নি, বরং নারী-পুরুষের সামাজিক-লৈঙ্গিক পার্থক্যকে করেছে অধিকতর সুসংহত।

বাংলা চলচ্চিত্রে পুরুষ চরিত্রের নির্মাণ হয়েছে ‘দানব, দেবতা ও পতি’রূপে, আর নারী যুগে যুগে স্থান পেয়েছে ‘সতী, নষ্টা ও এক্সস্ট্রা’ হিসেবে (সুলতানা : ২০০২)। নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্যকেই টিকিয়ে রেখেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। বাংলা চলচ্চিত্রে নারী-পুরুষের অবস্থান চিত্রায়িত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার হাত ধরেই। চলচ্চিত্র নির্মাণ, সম্পাদনা, প্রযোজনা থেকে সর্বস্তরেই পুরুষপ্রাধান্যের আধিক্য নারীকে একটি ছকে বেঁধে ফেলে। অন্যদিকে পুরুষকে দেয় মহাপরাক্রমশালীর সম্মান। বিগত দশকগুলোতে নারীপ্রধান চলচ্চিত্র কিছু তৈরি হলেও তাতে শেষপর্যন্ত নারীকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পুরুষকেই ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হতে হয়েছে। আমাদের সমাজের চিত্র বলা হয় চলচ্চিত্রকে, কিন্তু চলচ্চিত্র এক্ষেত্রে প্রায়ই নারী-পুরুষের সম্পর্ককে প্রভু-দাসের সম্পর্কে রূপ দেয়। এমনকি রোমান্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না। তাই বাংলা চলচ্চিত্রের কেবল নারী বা পুরুষ চরিত্রের স্বরূপ সন্ধান করে প্রকৃত চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন চলচ্চিত্রের সামগ্রিক জেন্ডার বিশ্লেষণ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

- সমকালীন বাংলা চলচ্চিত্রের নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের চরিত্র নির্মাণ ও চিত্রায়নের সামগ্রিক পর্যালোচনা;
- বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে নির্মিত বিভিন্ন ধারার চলচ্চিত্রের জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপন;
- চলচ্চিত্রে নির্মিত চরিত্রের সাথে আমাদের সমাজের বাস্তবতাকে মিলিয়ে বিচার করা;
- সমাজে প্রচলিত পুরুষতন্ত্র কীভাবে চলচ্চিত্রের চরিত্রে জেন্ডারকে স্টেরিওটাইপ করে উপস্থাপন করে তা অনুসন্ধান করা।

গবেষণা প্রশ্ন

এই গবেষণাটি নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে সম্পাদন করা হয়েছে :

- বিভিন্ন ধারার বাংলা চলচ্চিত্রে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টি দিয়েই নারী-পুরুষ চরিত্রের নির্মাণ করা হয় কি না?
- জেন্ডার ধারণা কীভাবে চলচ্চিত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়?
- বাংলা চলচ্চিত্রে তৃতীয় লিঙ্গের উপস্থাপন, প্রতিনিধিত্ব রয়েছে কি না?

বাংলা চলচ্চিত্রে জেন্ডার উপস্থাপন : ফিরে দেখা অতীত

বাংলা চলচ্চিত্রের শুরু থেকেই পুরুষ চালকের আসনে ছিল। চলচ্চিত্রে অভিনয় করা নারীদের জন্য একটি অপমানজনক বৃত্তি ছিল। তাই তথাকথিত 'ভদ্রঘরের' নারীরা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের কথা চিন্তাও করতেন না। বাংলা চলচ্চিত্রে জেন্ডার বৈষম্যের শুরু সেখান থেকেই। বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র 'দ্য লাস্ট কিস'-এর অভিনেত্রীদের আনতে হয়েছিল পতিতালয় থেকে। কিন্তু চলচ্চিত্রে অভিনয় তাদের সম্মানজনক অবস্থান বা প্রতিভার কদর কিছুই এনে দিতে পারে নি। তাই অভিনয় শেষে তাদের আবার পূর্বের পেশায়ই ফিরে যেতে হয় (সুলতানা : ২০০২)।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত চলচ্চিত্রগুলোর বিজ্ঞাপন থেকেও অনুধাবন করা যায়, বাংলা চলচ্চিত্রে জেন্ডার সম্পর্কের প্রথাগত উপস্থাপন :

চলচ্চিত্র বিজ্ঞাপন ১ : নারীকে তার চারিত্রিক শুদ্ধতার দোহাই দিয়ে স্টেরিওটাইপ করে রাখা হয়। নারীর জন্য 'সতী' 'অসতী বিশেষণে ভূষিত করার প্রবণতা ও নারীকে একটি সীমানায় আটকে ফেলার প্রবণতা বাংলা চলচ্চিত্রে শুরু থেকেই বিদ্যমান। বাংলা চলচ্চিত্রে 'সতী নারী'-র সন্ধান করা হলেও 'সতী পুরুষ'-এর ধারণা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কল্পনারও বাইরে।

চলচ্চিত্র বিজ্ঞাপন ২ : বাংলা চলচ্চিত্রে জেন্ডার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আশির দশকে নারীকে কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রী এবং পুরুষকে 'ঈশ্বরতুল্য' স্বামী হিসেবে উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষণীয়। নারীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে উপস্থাপন করা হয় পুরুষকে, পুরুষের আনুকূল্য লাভকে নারীর জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবেই চিত্রায়িত করা হয়।

‘স্বামীর সোহাগ’ নামক চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে—

মা-মেয়ে, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সবার মনে রাখার মতো একটি ছবি
মেয়েদের একমাত্র পছন্দ, বছরের শ্রেষ্ঠ সামাজিক ছবি

অর্থাৎ, চলচ্চিত্রটিতে নারীদের বহু আরাধ্য বস্তু হিসেবে ‘স্বামীর সামান্য আনুকূল্য’কে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ কারণে একে মেয়েদের একমাত্র পছন্দের ছবিও বলা হয়েছে।

চলচ্চিত্র বিজ্ঞাপন ৩ : আশির দশকে নারীকে মমতাময়ী মা, কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রী বা কোনো পুরুষনির্ভর চরিত্রে দেখা গেলেও ‘বিচার’ চলচ্চিত্রে নারীকে প্রতিবাদী চরিত্রে দেখা যায়। এই চলচ্চিত্রে অভিনয়কারীদের নাম দেখে বোঝা যায়, এর মূল চরিত্রগুলোতে নারীরা অভিনয় করেছেন।

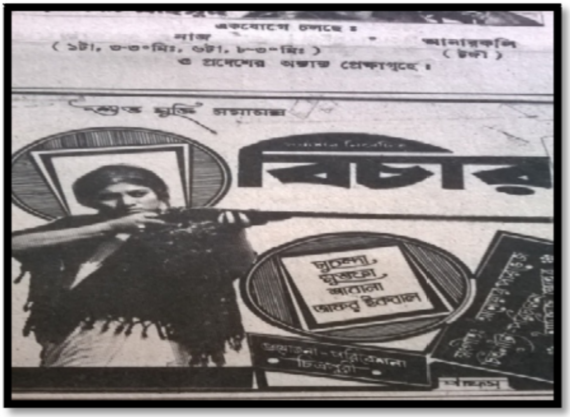

এখানে, জেন্ডার ধারণার কিছুটা হলেও ভিন্নধর্মী উপস্থাপন লক্ষ করা যায়।

তাত্ত্বিক ভিত্তি

এই গবেষণায় মূলত দুটি তাত্ত্বিক কাঠামোতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

১. Representation theory বা রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্ব;

২. Mulvy's male gaze theory বা লরা মালভির মেল গেজ তত্ত।

রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্ব : স্টুয়ার্ড হলের রিপ্রেজেন্টেশন হলো ভাষাকে ব্যবহার করে অর্থবোধক কিছু বলা। এর মাধ্যমে বিশ্বকে মানুষের কাছে অর্থপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয় (হল, ১৯৯৭: ২৪)।

ভাষার মাধ্যমে অর্থের রিপ্রেজেন্টেশন কীভাবে হয়ে থাকে তা ব্যাখ্যার জন্যে তিন ধরনের অ্যাপ্রোচ রয়েছে। এগুলোকে প্রতিফলনকারী (reflective), স্বেচ্ছাকৃত (intentional) এবং নির্মাণমূলক (constructionist) অ্যাপ্রোচ বলা হয়।

এই গবেষণায় রিপ্রেজেন্টেশনের নির্মাণমূলক অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর সংলাপ, ভাষার ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গি, গান, নাচ, পোশাক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে এর মাধ্যমে জেন্ডার সম্পর্ক কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মালভি'র মেল গেজ তত্ত্ব : লরা মালভির 'ভিজ্যুয়াল প্লেজার অ্যান্ড ন্যারেটিভ সিনেমা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। ফ্রয়েড ও লাঁকার মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের সাহায্যে লেখক এখানে নারীবাদী অবস্থান থেকে, বিশেষত হলিউডের মূলধারার ন্যারেটিভ সিনেমায় নারীর উপস্থাপন বিশ্লেষণ করেছেন (হক : ২০০৭)। তবে এই তত্ত্ব নিয়ে কাজ করা অনেক তাত্ত্বিকই মনে করেন, মালভি যেভাবে নারীর অবস্থানকে ব্যাখ্যা করেছেন, সেভাবে পুরুষের অবস্থানকেও ব্যাখ্যা করা চলে।

তবে সাধারণভাবে দেখনপ্রিয়তায় নারী অক্রিয়, পুরুষ সক্রিয়— এ ধারণাটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষ দৃষ্টি সুসজ্জিত নারী শরীরের ওপরই তার ফ্যান্টাসি প্রয়োগ করে।

চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থিতি কেমন হবে তা নির্ধারণ করে পুরুষতান্ত্রিকতাই। কারণ অধিকাংশ সময় ক্যামেরার পেছনে একজন পুরুষ থাকেন, পরিচালকও হন একজন পুরুষ। এমনকি দর্শকও নারীকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করে থাকে।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গণমাধ্যমের যেকোনো আধেয় বা টেক্সট বিশ্লেষণের অন্যতম স্বীকৃত পদ্ধতি হলো বর্ণনতত্ত্ব (Film Narratology)। এই গবেষণায় চলচ্চিত্র বর্ণনতত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র বর্ণনতত্ত্ব নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন জেরার্ড জেনেট (১৯৮০)। জেরার্ড তার ন্যারেটিভ ডিসকোর্স বইতে তিনটি পর্যায়ে বর্ণনতত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্লেষণের কথা বলেছেন। জেরার্ড জেনেট (জেনেট, ১৯৮০) প্রণীত ন্যারেটিভ ডিসকোর্সে বলা হয় 'ন্যারেটিভ' ধারণাটি তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত—

- বক্তব্য (recit)
- কাহিনি (histoire) এবং
- বর্ণন কৌশল (narration)

জেরার্ড জেনেট চলচ্চিত্র বর্ণনতত্ত্বের যে কাঠামো প্রণয়ন করেছেন, তার আলোকে এ অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে নমুনায়িত চলচ্চিত্রের বার্তা বিশ্লেষণ করা হবে। নমুনায়নকৃত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে প্রথমে 'অগ্নি', 'তারপর শুনতে কি পাও!' এবং সবশেষে 'কমন জেন্ডার' চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে।

সবার প্রথমে আলোচিত হবে মূল কাহিনির বর্ণনা, জেরার্ড জেনেট যাকে বলেছেন হিসটয়ার বা কাহিনি, এরপর রেসিট বা বক্তব্য অংশে আলোচিত হবে বার্তা উপস্থাপনে কোন বিষয়গুলো উঠে এসেছে। আর কীভাবে বা কোন কৌশল অবলম্বন করে এই বার্তা উঠে এসেছে তা আলোচিত হবে বর্ণন কৌশল বা ন্যারেশন অংশে।

গবেষণার নমুনায়ন

গবেষণার জন্য ২০১১-২০১৪ মেয়াদে মুক্তি পাওয়া ৩টি চলচ্চিত্র নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণার সুবিধার্থে বিচারিক নমুয়নায়ন (selective sampling) পদ্ধতির মাধ্যমে চলচ্চিত্রগুলোকে বেছে নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে, তা হলো—

- বৈচিত্র্যময় ফরম্যাটের চলচ্চিত্র;
- জেন্ডার ধারণার বৈচিত্র্য; এবং
- সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্র।

চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন : অগ্নি

মা-বাবার খুনের প্রতিশোধের নেশায় মগ্ন এক মেয়ের কাহিনি দিয়ে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্রটি। গবেষণা মেয়াদের মধ্যে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বাজেটে (৬ কোটি) নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন ইফতেখার চৌধুরী এবং প্রযোজনা করেছে জাজ মাল্টিমিডিয়া। ২০১৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারিতে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়।

কাহিনি : মা-বাবার খুনের প্রতিশোধ নিতে উন্মুখ তানিশাকে নিয়ে এ চলচ্চিত্রটি নির্মিত। তার মা-বাবাকে সে চোখের সামনে শৈশবে খুন হতে দেখেছে। তাদের খুন করেছিল আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন গুলজার ও বন্ধুরা। এই খুনিদের খুন করে মা-বাবার খুনের বদলা নিতে ছোট্ট নিশা পৌঁছায় তার মামার কাছে। মামার কাছেই সে অস্ত্র চালনা, মারামারির প্রশিক্ষণ লাভ করে। এদিকে খুনিদের সন্ধানে তানিশা থাইল্যান্ডে যায়, যেখানে খুনিদের রক্ষার্থে নিয়োজিত থাকে বক্সিং চ্যাম্পিয়ন আরেফিন শুভ (ড্রাগন)। সে কয়েকবার তানিশাকে ধরতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এদিকে, ড্রাগনের মামার বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে তানিশাকে দেখে আরেফিন শুভ তার প্রেমে পড়ে। তখনো তার অজানা ছিল যে এই মেয়েটিই খুনি। পরবর্তী ঘটনাক্রমে সে জানতে পারে, তানিশাই খুনি, যাকে সে খুঁজছে। তখন তানিশা পালিয়ে যায়। তানিশার সন্ধানে গুলজারের গুন্ডারা এসে তাকে না পেয়ে ড্রাগনের মামা-মামিকে খুন করে। তখন, ড্রাগনও তার মামা-মামির খুনের প্রতিশোধ নিতে উন্মুখ হয়ে পড়ে।

শেষদৃশ্যে তানিশা ও ড্রাগন মিলে খুনিদের শাস্তি দেয় এবং চলচ্চিত্রের সমাপ্তি হয়।

বক্তব্য : জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণে জেরার্ড জেনেট প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুযায়ী চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর ভাষা, অভিব্যক্তি, মুখভঙ্গি, গান, নাচ বিশ্লেষণ করে তাদের উপস্থাপন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নারী চরিত্রের উপস্থাপন ও অন্তর্নিহিত বক্তব্য বিশ্লেষণ

অ্যাকশনকন্যা নয়, মডেলকন্যা : চলচ্চিত্রে তানিশার চরিত্রটি অ্যাকশননির্ভর হলেও এটি শুরু হয় তার গাড়ি থেকে নামার দৃশ্য থেকে, যেখানে তার চেহারা দেখা যায় না, কিন্তু তার পা ও শরীরের পেছনভাগ এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন তাকে র‍্যাম্পে হাঁটা কোনো মডেলকন্যা বলেই মনে হয়। এখানে নারীর রিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে একটি প্রদর্শনবস্তু হিসেবে। আর এখানে ক্যামেরার পেছনের পুরুষতান্ত্রিক চোখটিই নারীকে এভাবে উপস্থাপন করে দর্শক টানতে চেষ্টা করেছে।

নারী মানেই যৌনবস্তু : হোটেলের করিডোর ধরে তানিশাকে হেঁটে যেতে দেখে একজন পুরুষ মন্তব্য করে 'Woow....Sexy', যেন নারী মানেই তার যৌন আবেদন থাকবে যা পুরুষের লালসাকে তৃপ্ত করবে। বাংলা চলচ্চিত্রে নারীকে কোমলমতী, মায়াবতী, সুনিপুণ গৃহিণী হিসেবে প্রদর্শনের পর এখন নতুন সংযোজন হিসেবে নারীকে প্রকাশ্যে এভাবে যৌনাবেদনময়ী হিসেবে দেখানো ও অন্যের মুখ দিয়ে ওরকম বলানোর প্রবণতা শুরু হয়েছে।

নারীর খণ্ডিত রূপ : প্রথম দৃশ্যেই নায়িকাকে চুইংগাম চিবিয়ে বেলুন ফোলাতে দেখা যায়। এখানে তার কেবল ঠোঁট দেখানো হয়। আবার গাড়ি থেকে নামার সময়, মারামারি করার সময় তার পায়ের উন্মুক্ত অংশ দেখানো হয়। এখানে মালভির মেল গেজ তত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে নারী গুরুত্বপূর্ণ না, কারণ নারী কিছু আকর্ষণীয় অঙ্গের খণ্ডিতরূপ মাত্র।

নারী আর মুরগি— একই কথা!! উভয়েই ভোগ্যবস্তু : তানিশা : এদেশে এলে কেন?

গাউস : ফার্মের মুরগিতে অরুচি ধরে গেছে, এখন দেশি মুরগি চাই। Sexy lady, just like you, you bitch চাই।

অর্থাৎ এখানে একজন নারী আর মুরগিকে সমান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুরগি যেমন মানুষের রসনাকে তৃপ্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তেমনি নারীকেও পুরুষ একইভাবে বাসনাকে তৃপ্ত করার একটি উপকরণ হিসেবেই দেখে।

বিনোদনসামগ্রী নারী : পুরুষের হাতের পুতুল : এই চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়, ভিলেন আলীরাজের সাথে সুইমিং পুলে কয়েকটি বিকিনি পরিহিত মেয়েকে, যারা তার মনোরঞ্জন করতে ব্যস্ত। কেউ তাকে জুস এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ তার সাথে হাস্যালাপে ব্যস্ত। আবার, পরক্ষণেই তার জরুরি ফোনকল আসায় সে হাতের ইশারায় মেয়েদের সরিয়ে দেয়। মেয়েরাও বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্থান করে। অর্থাৎ, যাই হোক না কেন নারীর অবস্থান একই থাকে আমাদের সমাজে, পুরুষের হাতের পুতুলই সে।

নারী সহজলভ্য : ভিলেন কিবরিয়াকে খুন করে তানিশা যখন পালিয়ে যায়, তখন ড্রাগন তাকে ধরার জন্য ধাওয়া করলেও ধরতে পারে না। কিন্তু বুঝতে পারে খুনি একটি মেয়ে। সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, তখন মামা চরিত্রের কাবিলা বলে—

একটা মেয়ে... একটা মেয়েকে ধরতে পারলে না! অর্থাৎ খুনিকে ধরতে না পারার চেয়ে একটি মেয়েকে ধরতে না পারার কারণেই ড্রাগনকে ধিক্কার দেয়া হচ্ছে। আমাদের সমাজে নারীকে সবসময়ই খুব সহজলভ্য, দুর্বল মনে করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতারই উদাহরণ উপস্থাপন করেছে এ চলচ্চিত্রটি।

নারী মানেই সুন্দরী : 'খুনি ধরতে এসে দেখি হুর পরী ধরসো...', ড্রাগনের উদ্দেশ্যে তার মামা কাবিলা এই মন্তব্য করে। নারীটি যেখানে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে, সেখানে সে কে, কোথায় থাকে, তার সংজ্ঞা কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, ইত্যাদি প্রসঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ হবার কথা। কিন্তু 'অগ্নি' চলচ্চিত্রটিতে এসব কিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে তানিশার সুন্দরী 'হুরপরী' পরিচয়টি।

নারীর পেশা নির্ধারণে বৈষম্য : চলচ্চিত্রটিতে হাসপাতালের কিছু দৃশ্য দেখানো হয়েছে, যেখানে নার্স একজন নারী এবং ডাক্তার একজন পুরুষ। এখানে আমাদের সমাজে প্রচলিত 'জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজন' পদ্ধতিই প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়া, এ চলচ্চিত্রে দর্শক আকর্ষণে আইটেম গানে নারীর অযৌক্তিক ব্যবহারও লক্ষণীয়।

নারী বিয়ের উপকরণমাত্র, ঘরের লক্ষ্মী : মামা (কাবিলা) ড্রাগনকে উদ্দেশ্য করে বলে, তুই কোনো দিন মাইয়া দেইখা এমন করস নাই। পাইলে বিয়া কইরা ফেলিস।

মামা তার থাই স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী।

'অগ্নি' চলচ্চিত্রের পুরুষতান্ত্রিক চরিত্রগুলোরই প্রতিনিধিত্ব করে মামা চরিত্রটি, যে মনে করে নারী কেবল পুরুষের স্ত্রী হিসেবে ঘরে থাকলেই ভালো।

নারী ভিতু : বাবা-মার খুনের প্রতিশোধ নিতে মরিয়া তানিশাকেও প্রথাগত নারী চরিত্রে স্টেরিওটাইপ হতে হয়। যে থাইল্যান্ড পর্যন্ত চলে আসে খুনিদের সন্ধানে, একদল গুন্ডাকে একাই কাবু করে ফেলে, সে তানিশাকেও নিজের পরিচয় লুকাতে একজন ভীতু, অসহায় নারীর অভিনয় করতে হয়।

এর মাধ্যমে দেখানো হয়, নারী পিস্তল দেখলে ভয়ে জ্ঞান হারায়, তেলাপোকা দেখে নায়ককে জড়িয়ে ধরে।

নারী 'বিনোদন সামগ্রী', জুয়া আর নারী একই কথা!! : তানিশার হাত থেকে বাঁচতে সেফ হাউজে লুকিয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত এক ভিলেন বলে, 'এখানে না আছে মেয়েমানুষ, না আছে জুয়াখেলা, এখানে কি থাকা যায়?'

চলচ্চিত্রটিতে নারীসত্তার চরম অপমান করা হয়েছে নারীর সাথে মুরগি, জুয়া এসব বস্তুর তুলনা করে। ভিলেনদের সবসময়ই দেখা গেছে, তাদের বিনোদনের খোরাক জোগাতে নারীদের ব্যবহার করতে। এক ভিলেনকে খুন করতে তানিশা যখন ছদ্মবেশে ভিলেনের গাড়িতে যায়, তখন তার বডিগার্ডকে বলতে শোনা যায় 'Boss is having fun.'

নারী একা দুর্বল, অক্ষম : ড্রাগন যখন জানতে পারে তানিশাই খুনি, তখন প্রথমেই সে ভাবে কেউ তাকে ভাড়া করে থাকবে, যে তাকে ব্যবহার করছে খুন করতে।

অর্থাৎ, নারী একা একা নিজের প্রয়োজনে দুঃসাহসী কোনো কাজ করতে পারে এটা পুরুষের চিন্তার অতীত।

নারীকেই সমঝোতা করতে হয় : মামা কাবিলা থাই নারীকে বিয়ে করলেও তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য ভাষা শিখতে তার তীব্র অনীহা। তাই শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে থাই নারীকেই বাংলা ভাষা শিখতে হয়। অন্যান্য সম্পর্কের মতো বৈবাহিক সম্পর্কেও নারীকেই সমঝোতা করতে হয়।

পুরুষ চরিত্রের উপস্থাপন ও অন্তর্নিহিত বক্তব্য বিশ্লেষণ

ক্যামেরার পেছনে পুরুষের চোখ : জেন্ডার বৈষম্যভিত্তিক সমাজের অধিকাংশ চলচ্চিত্রের ন্যায় এ চলচ্চিত্রেও ক্যামেরার পেছন থেকে পুরুষতান্ত্রিক চোখই কাজ করেছে। তাই অ্যাকশননির্ভর চরিত্রেও তানিশার জন্য প্রয়োজন হয়েছে হাইহিল জুতা, কড়া মেকআপ, উন্মুক্ত শরীর প্রদর্শন ও আপত্তিকর দেহভঙ্গি। অন্যদিকে নায়িকার কাছে প্রতিবার সম্মুখযুদ্ধে হেরে যাওয়া ড্রাগনের পরিচয় হয়েছে তার পেশিবহুল বাহু, দৃঢ় চোয়াল, গোঁফে নিরন্তর তা দেওয়া ও উদ্যত পিস্তল। এখানে একটি পার্থক্য স্পষ্টতই লক্ষণীয়।

পুরুষ সিংহ শুধু নয় বাঘও, নারী শিকার করে তারা : এক ভিলেন বলে, একা একা বসে থেকে বোর হয়ে গেলাম। অনেকদিন শিকার করি না। এভাবে বসে থেকে বাঘও শিকার ভুলে যায়। তারপর ভিলেন বের হয়ে যায় নারী শিকার করতে।

অর্থাৎ পুরুষের শিকার বা মনোরঞ্জনের সামগ্রী হলো নারী। আর পুরুষ হলো প্রতাপশালী বাঘ আর নারী নিরীহ হরিণশাবক মাত্র।

পকেটে টাকা থাকলেই পুরুষ নারীকে কিনতে পারে : ভিলেন ক্লাবের সামনে ছদ্মবেশী তানিশাকে দেখে কাছে ডাকে। তখন তানিশা ৫০০০ ডলার চায়। তখন ভিলেন রাজি হয়ে যায় এবং তানিশা তার সাথে চলে যায়। এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, টাকা থাকলে সহজেই নারীকে কিনে নেয়া যায়।

পুরুষ কান্নার দৃশ্যায়ন, প্রথাগত আচরণের বাইরে : আমাদের সমাজে পুরুষের কান্না করা এক অর্থে নিন্দনীয় মনে করা হয়। তাই আমাদের নাটক, চলচ্চিত্রেও আমরা সচরাচর পুরুষকে কাঁদতে দেখি না। কিন্তু এই চলচ্চিত্রে নায়ক আরেফিন শুভকে কাঁদতে দেখা যায়। এটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন।

বর্ণনকৌশল

কেন্দ্রীয় চরিত্র নায়িকা : বাংলাদেশের অধিকাংশ চলচ্চিত্র নায়ককেন্দ্রিক হলেও 'অগ্নি' চলচ্চিত্রটি নায়িকা তানিশাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। ফলে এতে একটি ইতিবাচক এবং ভিন্ন ধরনের বর্ণনকৌশলের পরিচয় পাওয়া গেছে।

নায়িকা চরিত্র অধিকাংশ সময় যেমন পুরুষ চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে, এক্ষেত্রে তা হয় নি।

ক্যামেরায় পুরুষতান্ত্রিক চোখ : নারীপ্রধান চলচ্চিত্র বলা হলেও ক্যামেরার পেছনের চোখটি ছিল পুরুষের। নায়িকার প্রতিশোধস্পৃহার চেয়ে তার দৈহিক সৌন্দর্যকে ক্যামেরায় তুলে ধরাই ছিল যার মূল লক্ষ্য।

জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজন : 'অগ্নি' চলচ্চিত্রে প্রথা ভেঙে অ্যাকশনধর্মী চরিত্রে নারীকে দেখানো হলেও নারীর সমঅধিকার বা সমঅংশগ্রহণ হয় নি মোটেও। এ কারণেই আমরা হাসপাতালে ডাক্তারের চরিত্রে একজন পুরুষকে দেখি আবার নার্সের চরিত্রে দেখি একজন নারীকে।

চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন : 'শুনতে কি পাও!'

সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে ভদ্রা নদীর পাড়ের মানুষের সহজ, সরল, শান্ত জীবন। কিন্তু এ জীবনে নিদারুণ আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় আইলা। এ গ্রামের আইলায় বিধ্বস্ত মানুষের যাপিত জীবন নিয়ে নির্মিত ডকু-ফিকশন 'শুনতে কি পাও!'। এ জীবনসংগ্রাম চলচ্চিত্ররূপ পেয়েছে অনেক মানুষের প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে।

চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ২০১৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষজনকে নিয়ে নির্মিত এ চলচ্চিত্রটি অর্জন করে বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা। ২০১৩ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউরোপের অন্যতম প্রামাণ্যচিত্র উৎসব দ্যু রিলের ৩৫তম আসরের সর্বোচ্চ পুরস্কার গ্রাঁ পি অর্জন করে চলচ্চিত্রটি। পাশাপাশি বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মানুষ কীভাবে জীবনের সাথে, প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে আছে তার একটি প্রামাণ্য দলিল এই 'শুনতে কি পাও!'।

কাহিনি : 'শুনতে কি পাও!' সুন্দরবনের পাশ ঘেঁষে অবস্থিত সুতারকালী গ্রামের মানুষের সহজ-সরল জীবনগাথা, কয়েক বছর আগে যাদের জীবন আইলার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই গ্রামের একশটি পরিবার আশ্রয় নেয় বেড়িবাঁধের ওপরে। তার মধ্যে রাখী-সৌমেনের পরিবারের প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম, হাসি-কান্না, সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি ও তাদের ছেলে রাহুলের ছোট ছোট আবদার— এসবের মধ্যে দিয়েই জীবন প্রতিফলিত হয়। রিলিফের জন্য মানুষের লম্বা লাইন, সুপেয় পানির জন্য হাহাকার এ গ্রামের মানুষের জন্য নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে গেছে। তারা আশা করে সরকারি কর্তৃপক্ষ তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করবে। নদীতে বাঁধ হবে, যাতে তারা নিজেদের পুরনো ভিটায় ফিরে যেতে পারে।

এদিকে প্রায়-উদ্বাস্তু জীবনেও রাখী গ্রামের শিশুদের পড়ানোর দায়িত্ব নেয়। নিজে ঋণ নিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন দেখে। রাখী-সৌমেন তাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যেও ছেলে রাহুলের জন্য পূজায় নতুন জামা কেনার কথা ভাবে। একসময় গ্রামবাসীরা মিলেই বাঁধ নির্মাণ করা শুরু করে। সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করে। বাঁধ নির্মাণ শেষে রাখী-সৌমেন আবার ফিরে যায় তাদের পুরনো ভিটায়, সেখানেও তাদের প্রকৃতির সাথে নিরন্তর যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

নারী চরিত্রের উপস্থাপন ও অন্তর্নিহিত বক্তব্য বিশ্লেষণ

নারীর ক্ষমতায়ন : আমাদের শহুরে, শিক্ষিত সমাজে যা সম্ভব নয়, দুর্গম গ্রামে তা স্বাভাবিক চিত্র। কাহিনিতে উঠে এসেছে কীভাবে আইলার ছোবল নারী-পুরুষের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে, যেখানে সবাই একসাথে মিলে তাদের ফেলে আসা জীবনে ফিরে যেতে কাজ করে। আইলা বিধ্বস্ত মানুষদের মধ্যে ত্রাণসমামগ্রী ভাগ করে দেয়ার দায়িত্ব নারীরা পালন করে। এমনকি রাতে গ্রামের চায়ের দোকানে বসে পুরুষদের পাশাপাশি একজন নারীও তার মতামত প্রকাশ করতে পারে। রাখী প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে একাই হাটে যেতে পারে। নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় এখানে।

নারী মমতাময়ী মা : প্রথম দৃশ্যে রাখীকে দেখা যায় ছেলেকে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াতে এবং সকালবেলা তৈরি করে স্কুলে পাঠাতে। আমাদের সমাজের দৃশ্যকেই যেহেতু পরিচালক তার ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে এনেছেন, তাই এখানে আমাদের সমাজের নারীর প্রথাগত চরিত্রই ফুটে উঠেছে।

স্মৃতিকাতর নারী : রাখীকে সবসময় দেখা যায় তার ফেলে আসা বাড়ির স্মৃতিচারণ করতে। কখনো তার শিশুপুত্র রাহুলের সাথে কখনোবা তার স্বামী সৌমেনের সাথে। কিন্তু তার স্বামী সৌমেনের বাড়ি ফিরে যাবার তাড়না লক্ষ করা যায় না। নাড়ির টান সবসময় নারীর মধ্যেই অধিক প্রত্যক্ষ করা যায়।

গৃহকর্মে নারী : চলচ্চিত্রটিতে রাখী ও অন্য নারীদের গৃহকর্মে অধিক ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে পুরুষদের দেখা যায় বাইরের কর্মকাণ্ডেই ব্যস্ত থাকতে।

নারীর বোধশক্তি সীমিত : রাখী তার স্বামীর জন্য একটি নতুন মোবাইল ফোন কিনে আনে। এতে বিরক্ত হয়ে সৌমেন তাকে বলে, 'মোবাইল কিনে আনছে কোটিপতির কইন্যা। বুঝবে না, শুনবে না কিছু, মোবাইল কিনে আনছে। আমি মাতার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, একফোঁটা ওষুধ জোটে না...'

অর্থাৎ, এখানে নারীর আর্থিক সক্ষমতা ও ক্রয় করার সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাকে তিরস্কার করা হয়েছে। আমাদের সমাজে প্রচলিতভাবে দেখা যায়, বিবাহিত নারীদের কোনো আচরণ মনঃপূত না হলে তার বাবা-মাকে তিরস্কার করা হয়। এখানে রাখীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

নারীর মানসিক দৃঢ়তা : আইলার আঘাতে সর্বস্ব হারানো পরিবারগুলোতে পুরুষদের চাইতে নারীদের মধ্যেই মানসিক দৃঢ়তা অধিক লক্ষণীয়। ঝড়ের আঘাতে যখন রাখীদের নবনির্মিত ঘরও বিপর্যস্ত, সৌমেন হতাশ হয়ে রাখীকে দুষছে, তখন রাখীকেই দেখা যায় ঝড়ের ঝাপটা উপেক্ষা করে কাজ করে যেতে, যেভাবেই হোক ঘরটিকে রক্ষা করে যেতে।

নারী দুর্বল : 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রটি তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বেশ কিছু ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলেও বাঁধ তৈরির শেষ পর্যায়ে এসে পুরুষতান্ত্রিক শক্তিরই জয় হয়। কারণ, যতদিন বাঁধের জন্য বস্তায় বালু ভরার কাজ ছিল, নারীরাও পুরুষদের সাথে সমান তালে কাজ করেছে। কিন্তু বস্তা বাঁধে ফেলার আগের দিন নারীদের বলে দেয়া হয়, 'মহিলাদের মধ্যে যারা অপারগ তাদের আসার দরকার নেই।' পরদিন বাঁধের কাজ করার দৃশ্যে দেখা যায় শুধু পুরুষরাই কাজ করছে।

পুরুষ চরিত্রের উপস্থাপন ও অন্তর্নিহিত বক্তব্য উপস্থাপন

নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও পুরুষের মূল্যায়নে পরিবর্তন হয় নি : রাখী একজন শিক্ষিত নারী। তাকে অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী মনে হলেও তার স্বামীর আচরণে সবসময় রাখীকে নিজের অধস্তন মনে করার প্রবণতাই প্রকট হয়। তার আচার-আচরণে কর্তৃত্বভাব স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়।

পুরুষ সংসারে পরাক্রমশালী : রাখী-সৌমেন সমানভাবে সংসারের সিদ্ধান্তগ্রহণ করে ও আর্থিক ব্যয়ভার বহন করে মনে হলেও রাখীর ওপর সৌমেনের কর্তৃত্ব ষোলোআনাই বজায় থাকে সবসময়। রাখী তার মোবাইল ফোন ফেরত চাইলে সৌমেন তাকে তীব্রভাবে তিরস্কার করে। এতে রাখী কষ্ট পেয়ে কান্না করলেও সেদিকে সৌমেন বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে না। বরং তাকে খাবার এগিয়ে দেয়ার জন্য বারবার তাড়া দেয়। রাখীও নির্বিকারভাবে তার আদেশ পালন করে চলে।

বর্ণনকৌশল

'শুনতে কি পাও!' প্রথাগত কোনো ফিকশনধর্মী চলচ্চিত্র নয়। এখানে, দর্শকের কাছে আইলা আক্রান্ত মানুষের সত্যিকারের জীবনসংগ্রামকে তুলে আনা হয়েছে ক্যামেরার মাধ্যমে। তাদের জীবন-জীবিকা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, স্বপ্ন সবকিছু মিলিয়ে 'শুনতে কি পাও!' একটি জীবনের প্রতিচ্ছবি। আর এখানে, ক্যামেরার চোখ লুকিয়ে চরিত্রগুলোকে অনুসরণ করে না বরং চরিত্রগুলোই ক্যামেরার সামনে চলে আসে।

চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপন : 'কমন জেন্ডার'

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জীবনের কঠিন বাস্তবতা, সুখ-দুঃখ, জীবন ও জীবিকা নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'কমন জেন্ডার' চলচ্চিত্রটি। ২০১২ সালে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জীবনের কঠোর বাস্তবতাকে দর্শকের সামনে তুলে এনেছেন পরিচালক নোমান রবিন।

কাহিনি : সমাজের আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোই জন্ম হয় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের। জন্মের সময় আলাদা কোনো পার্থক্যও দেখা যায় না। মূলত এরা পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে, তবে সে পরিবর্তনকে ছেলে বা মেয়ে কারো বৈশিষ্ট্যের সাথেই মেলানো যায় না। তাদের শারীরিক গঠন, আচরণগত পরিবর্তন পরিবার ও সমাজের কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তারা বুঝতে পারে না এদের কোন শ্রেণিতে রাখবে, পুরুষ নাকি নারী। সমাজ তখন তাদের আর স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। এই চলচ্চিত্রের কাহিনি এমনই কয়েকজন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জীবন নিয়ে।

মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেয়া বাবু (বাবলি) তার পরিবারের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ সে তৃতীয় লিঙ্গের একজন মানুষ। তার পরিবারে সে থাকতে পারে না। এমনকি তার পরিচয় দিতেও নারাজ তার বাবা-ভাই। তার মায়ের দিনরাত অশ্রু বিসর্জনও কেউ গ্রাহ্য করে না।

অন্যদিকে একটি ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সুষময়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যখন পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারে ও ছেলে বা মেয়ে নয়, তখন বাবা সুষময়কে একটি হিজড়া গোষ্ঠীর কাছে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু এতে ছিল মায়ের অসীম আর্তনাদ। সে সুষময় থেকে হয়ে যায় সুস্মিতা (সাজু খাদেম) এবং এই এলাকার হিজড়া গোষ্ঠীর মাসীর (সোহেল খান) কাছে বড়ো হয়। একবার এই পুরো হিজড়া গোষ্ঠী একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের আমন্ত্রণ পায় এবং তারা সবাই সেখানে গিয়ে নাচে গানে মাতিয়ে তোলে। সেখানে সুস্মিতাকে দেখে মুগ্ধ হয় সঞ্জয় নামের এক যুবক এবং সঞ্জয় হিজড়া জেনেও সুস্মিতার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়। ঘটনাক্রমে সঞ্জয় ও সুস্মিতার মধ্যে দারুণ বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে সুস্মিতার চলাফেরা ও মন মানসিকতার অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সে নিজেকে একজন নারী হিসেবে ভাবতে পছন্দ করে, সঞ্জয়কে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সঞ্জয়ের বাবা-মা তাকে হিজড়া বলে অপমান করার

পরে সে বুঝতে পারে সমাজ কখনো একজন হিজড়াকে সাধারণ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার দেবে না। পরে দুঃখে, অভিমানে নীরব প্রতিবাদে সুস্মিতা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

শেষ দৃশ্যে বাবলি নিজের মাকে একবারের মতো দেখতে গিয়ে প্রত্যাখাত ও প্রহারের শিকার হয়ে ফিরে আসে। নির্মম কান্নায় শেষ হয় চলচ্চিত্র কমন জেন্ডার। রেখে যায় একটি প্রশ্ন ‘বিধাতা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে পরকালে কীভাবে প্রতিদান দেবেন এ জীবন যন্ত্রণার?’

বক্তব্য

নারীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশও পুরুষের ওপর নির্ভরশীল : তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানদের মায়েরা তীব্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সন্তানদের সাথে দেখা করতে, তাদের সাথে থাকতে পারেন না। কারণ পুরুষ সদস্যরা তাদের সবসময়ই বাধা দেয়। নিজের সন্তানের সাথে একজন নারী কী আচরণ করবে তাও নির্ধারিত হয় পুরুষতন্ত্র দ্বারা। নির্মম এই আচরণকে মেনে নিতেও বাধ্য হয় অসহায় নারীরা।

পুরুষতান্ত্রিকতা নারীর পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গকেও অবদমিত করে রাখে : ‘কমন জেন্ডার’ চলচ্চিত্রে আমরা দেখি সংসারে নারীদের অবদমিত করে রাখে পুরুষরা। এমনকি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরাও পুরুষদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করে সমাজে টিকে থাকে তারা।

সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা পুরুষের : এই চলচ্চিত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর ভূমিকায় পুরুষকেই দেখা যায়। এমনকি সুস্মিতা ও সঞ্জয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ইতিও ঘটে সঞ্জয়ের বাবার নির্দেশেই। সঞ্জয়ও মুহূর্তেই বন্ধুত্ব ভুলে সুস্মিতাকে বলে, তুমি আসলেই একটা হিজড়া। এই প্রত্যাখ্যান সুস্মিতাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়।

বর্ণনকৌশল

পুরুষতান্ত্রিক চোখ : পরিচালক তাঁর পুরুষতান্ত্রিক চোখে চলচ্চিত্রটি তৈরি করেছেন, যেখানে দর্শকদের মনোরঞ্জন করার জন্য সব উপাদানই দেয়া হয়েছে। আইটেম গানে বিদেশি মডেল ব্যবহার করে দর্শকদের প্রথাগত সন্তুষ্টি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে খুব প্রকাশ্যেই।

নারী ও তৃতীয় লিঙ্গের অসহায়ত্ব : পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ নিতান্তই অসহায়। পরিচালক এই অসহায় অবস্থাকে ক্যামেরায় সংরক্ষণ করেছেন।

তাই তাঁর চলচ্চিত্রে একজনও প্রতিবাদী, নিজের অধিকার আদায়ে সংগ্রামী চরিত্র দেখা যায় না।

গবেষণার জন্য গৃহীত নমুনার আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলা চলচ্চিত্রে এখনো জেন্ডার সংবেদনশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বিশেষত, বাণিজ্যিক

চলচ্চিত্রে সস্তা বিনোদনের জন্য নারীকে হেয় করে উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষণীয়। বাংলা চলচ্চিত্রে পরিচালনা থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র তৈরির বিভিন্ন স্তরে যাঁরা থাকেন তাঁদের অধিকাংশই পুরুষ। তাঁরা পুরুষতান্ত্রিক চোখ দিয়েই চলচ্চিত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, চরিত্রের নির্মাণকে উপস্থাপন করেন। জেন্ডার রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে নারীকে নিপীড়িত, নির্ভরশীল, গৌণবস্তু, ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অন্যদিকে পুরুষকে শক্তিশালী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার, নারীর প্রতি অনুগ্রহকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। পর্দায় জেন্ডার ধারণার এরূপ উপস্থাপন ঘটানো হয় নারী ও পুরুষের উপস্থাপনের ভিন্নতা দ্বারা। নারীকে সৌন্দর্যের আধার আর পুরুষকে ইস্পাতকঠিন ব্যক্তিত্বের আধার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বাংলা চলচ্চিত্রে সচরাচর তৃতীয়লিঙ্গের উপস্থিতি দেখা যায় না। 'কমন জেন্ডার' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্রের এই অপূর্ণতা দূর করার একটি প্রয়াস নেয়া হয়েছে মাত্র। তবে, এখানেও দর্শককে আকর্ষণ করার জন্য নারীকে অসংবেদনশীল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে আইটেম গানের মাধ্যমে। এমনকি একটিও প্রতিবাদী, আত্মনির্ভরশীল নারী চরিত্র দেখা যায় নি চলচ্চিত্রটিতে। তবে আশার কথা যে, বাংলাদেশে নারী-পুরুষের পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গকে নিয়েও চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে।

অনেকেই মনে করেন যে চলচ্চিত্র সমাজের দর্পণ। এই বিবেচনায় চলচ্চিত্রের জেন্ডার অসংবেদনশীলতা সমাজের চিত্রেরই প্রতিফলন। কিন্তু সমাজে যা যেভাবে ঘটে তাই যদি হুবহু দেখানো হয় তাহলে তার জন্য সমাজই আছে, আলাদা করে চলচ্চিত্রের দরকার নেই। যখন চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমটিতে কেউ কাজ করতে আসবেন তখন তাকে কেবল কারিগরিভাবে দক্ষ হলেই হবে না, সমাজের অসংগতিগুলো দূর করায় কীভাবে ভূমিকা রাখা যায় সে ব্যাপারেও স্পষ্টতা থাকতে হবে। চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমের ভেতর দিয়ে যা খুব ভালোভাবে করা সম্ভব। কারণ জনপ্রিয় একটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার মানুষের প্রতি কোনো সংবেদনশীলতা উপস্থাপিত হলে সমাজে এর একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে বাধ্য। কাজেই চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ সংক্রান্ত দায় এড়াবার কোনো সুযোগ নেই।

জেনিনা ইসলাম আবির গবেষণা সহকারী, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ। abir.jenina@gmail.com

তথ্যসূত্র

- সুলতানা, শেখ মাহমুদা (২০০২)। *'ঢাকার চলচ্চিত্রে নারী : দানব, দেবতা ও পতির রাজ্যে নষ্টা, এক্সট্রা ও সতী,'* নাসরীন, গীতি আরা, মফিজুর রহমান ও সিতারা পারভীন সম্পাদিত। *গণমাধ্যম ও জনসমাজ*। ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী।
- হল, স্টুয়ার্ট (১৯৯৭)। রেপ্রিজেন্টেশন (ফাহমিদুল হক অনূদিত)। *যোগাযোগ, সংখ্যা ৮*, (২০০৭)। ঢাকা।
- মালভি, লরা (১৯৭৫)। *চোখের আরাম ও বর্ণনাধর্মী চলচ্চিত্র* (ফাহমিদুল হক অনূদিত)। *যোগাযোগ, সংখ্যা ৮*, (২০০৭)। ঢাকা।
- Genette, Gerard, (1980), *Narrative Discourse,* Oxford: Basil Blackwell
- Hall, S. (1992). Culture, Media, Language: Working papers in cultural studies, 1972-79. Routledge.